https://www.bbc.com/bengali/news-54143260

পুলিশ হেফাজতে মৃত্যুর বিচার: ' ভয়ভীতি দেখানোর পর তারা ২০ লাখ টাকায় আপোষের প্রস্তাব দিয়েছিল'

- সায়েদুল ইসলাম
- বিবিসি বাংলা, ঢাকা

১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২০

বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো পুলিশি হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনায় কোন মামলার রায় হল।

পুলিশের বিরুদ্ধে মামলা করার পর একের পর এক ভয়ভীতি, প্রলোভন, হুমকি-ধামকির ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে বাদী ইমতিয়াজ হোসেন রকি ও তার পরিবারকে।

তারপরেও ভাই হত্যার বিচারের দাবি থেকে তারা সরে আসেননি।

অবশেষে সাড়ে ছয় বছর পর সেই মামলার রায় হয়েছে।

২০১৪ সালে পুলিশের হেফাজতে মোহাম্মদ জনি নামে এক ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনায় দায়ের করা মামলায় গত ৯ই সেপ্টেম্বর ৫ জন আসামীর মধ্যে তিন জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত। অপর দুই জনকে সাত বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে।

২০১৩ সালে নির্যাতন এবং পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু নিবারন আইন প্রণয়নের পর বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো পুলিশি হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনায় কোন মামলার রায় হল।

রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা হবে বলে জানিয়েছেন আসামিপক্ষের আইনজীবী।

কিন্তু পুলিশের বিরুদ্ধে মামলা করার পর বিচার প্রাপ্তিতে কি ধরণের চ্যালেঞ্জ পার করতে হয়েছে ঢাকার ইরানি ক্যাম্পের এই বাসিন্দাকে?

বিবিসি বাংলার কাছে সেই বর্ণনা তুলে ধরেছেন মামলার বাদী ইমতিয়াজ হোসেন রকি।

সেদিন যা ঘটেছিল

২০১৪ সালের আটই ফেব্রুয়ারি দিবাগত রাতে মিরপুর এগারো নম্বরের ইরানি ক্যাম্পে আমার ভাইয়ের বন্ধু বিল্লালের গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান হচ্ছিল। সেখানে আমরা সবাই ছিলাম।

একপর্যায়ে সেখানে পুলিশের দুইজন সোর্স এসে মদ খেয়ে এসে মেয়েদের সঙ্গে উশৃঙ্খলা করছিল। তখন সেখানে সবাই মিলে তাদের বুঝিয়ে বের করে দেয়া হয়। একটু পরে তারা আবার এসে একই ধরণের আচরণ করে। তখন সোর্স সুমনকে একটি থাপ্পড় দিয়ে তাড়িয়ে দেয়া হয়। তখন সে বলে, একটু পরে এসে তোদের দেখিয়ে দিচ্ছি।

এর কিছুক্ষণ পরেই এসআই জাহিদের নেতৃত্বে ২৫ থেকে ৩০জনের মতো পুলিশ সদস্য এসে আমাদের স্টেজ ভাংচুর করতে শুরু করে। সেই সময় লোকজনকে এলোপাথাড়ি মারধর করে আমাদের দুই ভাইকে গাড়িতে তুলে থানায় নিয়ে যায়। সেখানে আমাদের বিয়ের আসরের আরও তিনজনকে ধরে এনেছে দেখতে পাই।

সেখানে আমাদের বেধড়ক মারপিট করা হয়। দোতলার পিলারের কলামের সাথে আমাদের বেঁধে সাত আটজন পুলিশ সদস্য মিলে আড়াই ঘণ্টা ধরে মারে। কয়েকটা ষ্ট্যাম্প ভেঙ্গে যায়।

যখন পানি চাই, বুকের ওপর পা দিয়ে মুখে থুথু দিয়ে দেয়।

মারধরের একপর্যায়ে আমরা অসুস্থ হয়ে পড়লে আমাদের কাছের আধুনিক হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে পুলিশের কথায় ডাক্তার ব্যথার ওষুধ দিলে আমাদের এনে হাজতে ভরে রাখে।

ভাইয়া বুকের ব্যথায় ছটফট করছিল। দুই ভাইর এমন অবস্থা ছিল যে, কেউ কাউকে একটু সাহায্যও করতে পারছিলাম না। একপর্যায়ে তারা ভাইয়াকে বের করে নিয়ে যায়।

পরদিনে জোহরের নামাজের পর বাকি চারজনে হাজত থেকে বের করে একটা গাড়িতে তুলে নির্জন এলাকায় নিয়ে যায়। তখনো আমরা ভাইয়ার কোন খোঁজ জানি না। আমাদের নিয়ে কয়েকটা জায়গায় ঘুরতে থাকে আর ফোনে কার কার সঙ্গে যেন আলোচনা করতে থাকে। তারা আমাদের গুম করার চেষ্টা করছিল।

এদিকে আমাদের ধরে নিয়ে গেছে, কিন্তু পুলিশ সেটা স্বীকার করেনি বলে হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নেমে যায়। তখন গুম করতে না পেরে আমাদের আদালতে নিয়ে যায়। সেখান থেকে আমাদের কারাগারে পাঠানো হয়।

ভাইয়ের মৃত্যু

কারাগার থেকে এলাকায় এসে দেখি, বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী চারদিকের রাস্তা আটকে রেখেছে। বাঁশ সরিয়ে আমার বাড়িতে যখন যাই, দেখি আমার ভাইয়ের জানাজার প্রস্তুতি চলছে। আমার মাথায় যেন পুরো বিশ্ব ভেঙ্গে পড়ে।

একদিকে ভাইকে কবর দিতে নিয়ে যাওয়া হয়, আর আমাকে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে।

মামলা

পরের দিন আমার মা থানায় মামলা করতে যান। কিন্তু পুলিশ মামলা নেয়নি। বরং পুলিশ নিজেরা বাদী হয়ে মামলা করে যে, দুই দলের সংঘর্ষে আমার ভাই জনি মারা গেছে।

পরে আমার আম্মু ব্লাস্টের সহযোগিতায় ঢাকার মুখ্য মহানগর আদালতে একটি মামলা করেন।

তখন পুলিশ বাদী এবং আম্মু বাদী- দুইটা মামলায় তদন্তের জন্য গোয়েন্দা পুলিশকে (ডিবি) দেয়া হয়।

তখনো আমি অসুস্থ । তারপরেও পুলিশ কমিশনার, পুলিশ হেডকোয়ার্টার, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, ডিবি অফিস, এমন কোন জায়গা বাদ নেই যেখানে আমি সাক্ষী দিতে যাইনি। সবাই সান্ত্বনা দিতেন যে, তোমার ভাইয়ের বিচার হবে।

পুলিশের সাথে আসামী

একদিন ডিবি অফিসে গিয়ে দেখতে পাই, মামলার তদন্তকারীর সঙ্গে বসে একসঙ্গে ক্যান্টিনে খাবার খাচ্ছে এসআই জাহিদ। যিনি তদন্ত করে রিপোর্ট দেবেন, তিনিই যদি আসামীর সঙ্গে বসে খান, তাহলে কীভাবে তিনি নিরপেক্ষ রিপোর্ট দেবেন?

আবার মামলা

মহিলা আইনজীবী সমিতির সহায়তায় আমি ২০১৩ সালে নির্যাতন এবং হেফাজতে মৃত্যু নিবারণ আইনটির কথা জানতে পারি। তখন আমি এই আইনে আদালতে আরেকটা মামলা করি।

সেই মামলায় বিচার বিভাগীয় তদন্তের আদেশ দেয়া হয়।

সেই তদন্তে সব সাক্ষীরা বক্তব্য দেন।

২০১৫ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি সেই বিচার বিভাগীয় তদন্তের প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। ২০১৬ সালের ১৭ই এপ্রিল অভিযোগ গঠন করা হয়।

মামলা প্রত্যাহারে চাপ

বিচার শুরু হওয়ার যেন আমার আসল যুদ্ধ শুরু হয়।

প্রথমে এলাকার স্থানীয় প্রভাবশালীদের আমাদের বাড়িতে পাঠানো হয়। আমাকে তাদের অফিসে ডেকে পাঠানো হয়। বিভিন্নভাবে হুমকিধামকি, ভয়ভীতি দেখানো হয় যে, আমি যদি পুলিশ সদস্যদের মামলা থেকে বাদ না দেই, আপোষ না করি, তাহলে তুমি ভাবতে পারবে না যে কত ক্ষতি হবে। বাংলাদেশে কি কখনো দেখছো পুলিশের বিচার হয়েছে?

তারা বলতো, তোমার একটা টাকাপয়সার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। জনির দুইটা সন্তান আছে, তাদের যেন একটা ভবিষ্যৎ হয়।

মামলার আসামী এসআই জাহিদ আপোষ করার জন্য আমাকে ২০ লাখ টাকার প্রস্তাব দিয়েছিল। মামলা তুলে নিলে এসআই রশিদুল, মিন্টুসহ সব আসামী মিলিয়ে ৫০ লাখ টাকার প্রস্তাব দিয়েছিল।

তারা যখন আমাকে কিনতে পারেনি, তখন আমাদের সাক্ষীদের কিনে নেয়ার চেষ্টা করেছে।

এসব বিষয়ে আমি গণমাধ্যমের সঙ্গে যোগাযোগ করতাম। ১০ জনের সঙ্গে যোগাযোগ করলে হয়তো দুইজন খবর প্রকাশ করতো।

তারা যখন আমাকে, সাক্ষীদের কিনতে পারলো না, তখন তারা হাইকোর্টে রিট করে মামলাটা স্থগিত করিয়ে দিল। তখন আমি তো পুরো ভেঙ্গে পড়লাম। আমার তো হাইকোর্টে যাওয়ার ক্ষমতা নেই। তারপরেও সাহস নিয়ে এগোলাম।

কিন্তু সেখানে মামলার ফাইলিং, উকিল ধরলেই একলাখ টাকা লাগে। আমি গরীবের সন্তান, বাপ নেই, থাকি ক্যাম্পের ভেতর ছয় ফিট বাই ছয় ফিট ঘরের ভেতর। এর ভেতর আমি এতো টাকা কই পাবো? আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করতাম।

হাইকোর্টের আদেশ

তখন ব্লাস্টের মাধ্যমে সারা আপার (ব্যারিস্টার সারা হোসেন) সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। তিনি বিনা পয়সায় আমাকে আইনি সহযোগিতা করলেন।

দেড় বছর দৌড়াদৌড়ি করার পর পুনরায় মামলার কার্যক্রম চালু হওয়ার রায় পেলাম।

হাইকোর্ট আদেশে বলেছিলেন, ১৮০ দিনের মধ্যে যেন মামলার বিচার কার্যক্রম শেষ হয়ে যায়। কিন্তু চারমাসেও হাইকোর্টের সেই আদেশের কাগজ জজ কোর্টে কেন যেন পৌঁছায়নি। পরে আমি এটি গণমাধ্যমের ভাইদের জানালাম। বিভিন্ন কাগজে খবর বের হলো। তার দুইদিন পরেই সেই কাগজটা আদালতে পৌঁছে যায়।

এরপর আবার বিচার শুরু হয়। সাক্ষীরা সাক্ষ্য দিতে শুরু করেন। অবশেষে গত নয়ই সেপ্টেম্বর আমার ভাইয়ের হত্যার বিচারের রায় পেলাম।

তবে একটা কথা বলতে চাই। আমি কিন্তু পুরো পুলিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে মামলা করিনি। আমি করেছি তখনকার পুলিশ অফিসার এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে, যে পুলিশের পোশাক পরে অপরাধ করেছে। তাদের বিরুদ্ধে আমি মামলা করেছি, বিচার পেয়েছি।